ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/004

কন্যাশিশু ধর্ষণ: অপরাধীদের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়া

জোবাইদা নাসরীন*
মো: সেলিম হোসেন**

Abstract: Child rape is turning into a dire crisis in Bangladesh, with child sexual abuse likely beingthe least reported form of sexual violence. This article investigates the factors motivating perpetrators of child rape and examines their psychological and social experiences. Finally, the article recommends measures to stop child rape. Due to the sensitivity of the subject matter and the unique circumstances of the respondents, the data collection and analysis methods in this study differ from another social research. As the main purpose here is to examine the psychology of rape, we reviewed rape cases and conducted interviews with relatives of both victims and convicted offenders. This approach aims to explore factors linked to the perpetrators' histories of abusive behaviour, drawing on respondents' detailed accounts of psychosocial and sexual experiences from childhood to adulthood. The study reviewed a total of 12 cases from five districts, involving interviews with 20 women and 17 men from 24 families related to these cases. This study finds that, in most cases, the rapists were either relatives or acquaintances of their victims. This suggests that the perpetrators believed it was easier for them to keep the incidents secret or manageable, assuming that the relatives were less likely to file complaints against them. Such

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

psychological motivations drove many individuals toward committing rape. An analysis of case data on rapists reveals that a significant proportion of perpetrators experienced sexual violence in their own childhoods. These individuals often repressed memories of sexual abuse against them, later expressing these repressed impulses toward those who are perceived as less powerful or capable than themselves. Child rape is one manifestation of this dynamic. Data also indicates that rapists frequently target children as a means of asserting power and influence.

মুখ্যশব্দ : শিশু ধর্ষণ, মনস্তত্ত্ব, ক্ষমতা, জাতি বিদ্বেষ

১. প্রাককথন

বাংলাদেশে কন্যাশিশু ধর্ষণ দ্রুত বেড়েছে। বিচারহীনতা, দুর্বল চার্জশিট, বিচার কার্যক্রমে বিলম্ব, সাক্ষীর অভাব, ক্ষমতাধরদের চাপ, মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে স্থানিক দূরত্ব, পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, সামাজিক হেনস্থা এবং পরবর্তীকালে ধর্ষণের শিকার নারীর অনিরাপত্তাসহ নানাবিধ কারনে ধর্ষণের শিকার নারী বিচার পায় না এবং শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করার প্রবণতা আরও কম (Nasreen, 2021) । বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৯২ জন কন্যা শিশু। তার মধ্যে ৮১ জন শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং বখাটেরা উত্ত্যক্ত করেছে ৫৬ জনকে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো শিক্ষকের কাছে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ২৮ জন কন্যাশিশু।[i] ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তথ্য অনুযায়ী, শুধু ঢাকা মহানগরে যত কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়, তার প্রায় ৭৬ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার এবং তাদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছর বছর। প্রায় ৭৪ শতাংশ শিশু আপত্তিকর স্পর্শের শিকার হয়েছে। আর ৩৪ শতাংশ শিশুকে জোর করে অশ্লীল ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ২৮ শতাংশ শিশুকে যৌনাঙ্গ স্পর্শের মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়েছে এবং প্রায় ২৪ শতাংশ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছ।[ii] আরও আমলে নেয়ার বিষয় হলো, শতকরা ৭৫ ভাগ যৌন হয়রানির ঘটনাই ঘটে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু বা আত্মীয়দের মাধ্যমে এবং প্রতি চার জনে একজন মেয়েশিশু যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।[iii] শিশুদের যৌন নির্যাতন সম্ভবত সকল ধরনের যৌন নির্যাতনের মধ্যে সবচেয়ে কম রিপোর্ট করা হয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে অপরাধী এই বলে হুমকি দেয় যে, যদি তারা

তাদের বাবা মাকে এই বিষয়টি জানায় তবে তাদের বাবা মা বিশ্বাস করবে না (Gavey, 2005)। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ ধর্ষণ নিয়ে যত কাজ হয়েছে তার বেশির ভাগই হয়েছে ধর্ষণের বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা এবং সেগুলোতে গুরুত্ব পেয়েছে নারীর বয়ান (Kabir et al, 2017), ধর্ষণের আর্থ-সামাজিক কারণ বিশ্লেষণ (Rahman et al, 2021)।

২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে'র ৮নং আইনে শিশু নির্যাতন সম্পর্কে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। আইনে "নবজাতক শিশু" বলতে অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের কোনো শিশু এবং "শিশু" বলতে অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোনো ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। ২০২০ সালে আইনের ৭, ৯, ১৯, ২০, ৩২ নং ধারা সংশোধন করা হয়। শিশুকে ধর্ষণ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়।[iv] জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, সব ধরনের সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষা করা তাদের মৌলিক অধিকার। যার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা নির্মূলে এসডিজি ২০৩০ এজেন্ডায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি ১৬.২) অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এটি শিশুর ভয়, নির্যাতন, অবহেলা ও শোষণমুক্ত হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার বাস্তবায়নের দিকেও নতুন পরিসর তৈরি করে।

১.১ গবেষণা ঝোঁক

কোন কন্যা শিশুরা র্ধষণের টার্গেট হচ্ছে? –এর সামাজিক মনস্তত্ত্ব কী এটির অনুসন্ধান– এই প্রবন্ধের মূল জায়গা। আর এই মূল আগ্রহকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধের ঝোঁক দুটো। প্রথমত অপরাধীদের শিশু ধর্ষণের অনুপ্রেরণামূলক কারণগুলো অনুসন্ধান। দ্বিতীয়ত কন্যা শিশুদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে অপরাধীদের মানসিক এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার তালাশ। তবে শেষাংশে নারী শিশু ধর্ষণ বন্ধে করণীয় বিষয় নিয়েও এই প্রবন্ধ আলাপ রয়েছে।

Stotzer and Cartnez (2015) তাঁদের গবেষণায় পৌরাণিক কাহিনিকে ধর্ষণের গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষমতায় থাকার আকাঙ্ক্ষা, পর্ণোগ্রাফির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণকে শিশু ধর্ষণের সঙ্গে সম্পকযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের গবেষণায় কী কারনে শিশুদের ধর্ষণ করা হয় সে বিষয়ে জানা যায় না।

কন্যাশিশু ধর্ষণের সকল ধর্ষকের উদ্দেশ্যই যে এক এমন নয়। তারা একটি অত্যন্ত বৈচিত্রময় জনসংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত (Sagiv and Schwartz, 1995)। যাই হোক, বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে এটি পাওয়া গেছে যে, শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষকদের মধ্যে বেশ

কিছু মিল রয়েছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুরুষরা সেখানে বেশি যৌন সহিংসতা করে যেখানে তারা কোন শাস্তি পায় না (National Sexual Violence Center, 2004)। উপরন্তু, এটিও পাওয়া গেছে যে অপরাধীরা তাদের যৌন অপরাধকে ন্যায়সঙ্গত বা যৌক্তিক করার চেষ্টা করে (Slicner, 2007)।

আমরা আমাদের সমাজে প্রায়ই লক্ষ্য করি যে পুরুষদের নারীর উপর প্রভাবশালী এবং নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক হতে শেখানো হয়। এটি আসলে এক ধরনের হাইপার-পুরুষত্ব, [v] যৌন আগ্রাসনকে সমর্থন দেয়, ধর্ষণের পৌরাণিক কাহিনির বিকাশ এবং অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক যৌন বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে (Kilmartin, 2000; Rozee and Koss, 2001)। এছাড়া সহিংস যৌন কল্পনা, ধর্ষণের চিত্র, ধর্ষণকে 'সাধারণ' বিষয় হিসেবে দেখা এবং নারী নিপীড়নকে উৎসাহ দেয়া সহিংস পর্ণোগ্রাফি এবং যৌন উত্তেজনা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে (DeKeseredz and Schwartz, 2005; Malamuth, 1981; Malamuth and Check, 1984)। এর পাশাপাশি অ্যালকোহলের অপব্যবহার ও কলেজ পড়ুয়া নারীদের ধর্ষণের (যাদের বয়স ১৮ বছরের কম) সঙ্গে একটি দৃঢ় সম্পর্ক পাওয়া গেছে (Norris and Cubbins, 1992; Prentkz and Knight, 1991; Preslez et al., 2002)। তাই বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষকের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করার জন্য কী কী ধরনের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে সেটি জানা খুবই প্রয়োজন।

১.২ মাঠ ও গবেষণা-নৈতিকতা

বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধটি একটি গবেষণার অংশ। এই গবেষণায় মূল উত্তরদাতারা থাকার কথা নারী শিশু ধর্ষণের আভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা, যারা মূলত কারাগারে আছেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, কোথায় সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে? এর উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। কারণ এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কারণ ধর্ষণের শিকার বেশির ভাগ নারীই নানা আর্থ-সামাজিক এবং ভয়-ভীতির কারণে থানায় মামলা করেন না।

বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা এ গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রথমে বাছাই করা হয়েছে।[vi] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে এই পাঁচটি জেলাকে বেছে নেওয়া হলো। আমরা প্রথমে পত্রিকার রিপোর্ট থেকে শিশু ধর্ষণের খবর সংগ্রহ করি। এরপর যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তার একটি তালিকা তৈরি করি। সেখান থেকে আমাদের

যোগাযোগ কোন কোন জেলায় রয়েছে তা নির্ধারণ করে সেই তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে যোগাযোগ শুরু করি। তবে এক্ষেত্রে অভিযোগকারী শিশুর পরিবার এবং ধর্ষকের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তারা কেউই যেন এই গবেষণায় সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অস্মানিত না হন সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়েছে। এর পাশাপাশি উভয় পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টিও আমাদের সব সময় আমলে নিতে হয়েছে। ধর্ষণের শিকার শিশুর পরিবার প্রথমে কথা বলতে রাজি হননি। কারণ তারা ভয় পেয়েছিল। তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি তাদের মধ্যে রয়েছে। তারপর তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার পর তারা গবেষণায় সহায়তা করতে আগ্রহী হন।

এখানে আরেকটি বিষয় খুবই জরুরী যে, আমরা ধর্ষণের শিকার শিশুর সঙ্গে কোনো ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করিনি। শুধু শিশু বলেই নয় তাঁর রিট্রোমাজাইশেনে[vii] র বিষয়কে মাথায় রেখেই এই গবেষণায় এটিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুই পরিবারের সদস্যরাও যেন কোনো ভাবেই রিট্রোমাটাইজড না হন সেই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ ছিল।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

কাজের শুরুতে আমরা ভেবেছিলাম কারাগারে আসামীদের সাক্ষাৎকার নেয়ার অনুমতি পাব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচনার পর কারাগারের অভ্যন্তরে অনুমতি না পেয়ে আমাদের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে নুন করে ভাবতে হয়। তাই আমাদের কাজটির জন্য পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া বেশ জটিল হয়ে পড়েছিল। তারপর আমরা প্রথমে যে কাজটি করি তা হলো, আমাদের নির্বাচিত সেই পাঁচটি জেলার মহিলা ও শিশু ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি। এর পাশাপাশি আমরা সেসব জেলার শিশু-ধর্ষণ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমরা সেই মামলার উকিলদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের থেকে তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করি। তারাও প্রথমে সহযোগিতা করতে রাজি হননি। এই গবেষণার গবেষণা সহকারীরা অঞ্চলভিত্তিক ছিলেন। যেহেতু এই গবেষণার জন্য তথ্য পাওয়া ছিল চ্যালেঞ্জিং তাই গবেষণা সহায়ক নির্বাচন করাও কঠিন ছিল।

বলে রাখা একেবারেই প্রয়োজন যে, বিষয়ের সংবদেনশীলতা এবং উত্তরদাতারা বিশেষ অবস্থায় থাকার কারণে এই গবেষণায় তথ্য-প্রাপ্তি ও বিশ্লেষণ অন্যান্য গবেষণার মতো নয়।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার নির্মাণ দেখানো। যখন পরিকল্পনা মত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, তখন গবেষণা তথ্য পেতে আমরা গবেষণা পদ্ধতি পরিবর্তন করি। তখন আমরা ধর্ষণের কেসগুলোকে পর্যবেক্ষণ এবং ধর্ষণের শিকার শিশুর আত্মীয়-স্বজন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তবে মামলার সূত্র ধরে প্রথমে ধর্ষণের শিকার শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সেটাও সহজ ছিল না। অপরাধীদের 'আপত্তিকর' আচরণের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণগুলি পরীক্ষা করার জন্য, উত্তরদাতাদের শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের মনো-সামাজিক এবং মনো-যৌন অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ সরবরাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা এই গবেষণায় পাঁচটি জেলা থেকে মোট ১২টি মামলা পর্যালোচনা করেছি এবং এই ১২টি মামলার সাথে যুক্ত মোট ২৪টি পরিবারের ৩৭ জন (নারী ২০, পুরুষ ১৭) সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অকাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Unstructured Interview), হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা (Walking Interview) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত ১২টি মামলার মধ্যে ৫০ শতাংশই ঘটেছে গ্রামে। ২৫% শহরতলিতে ঘটেছে।

২. অপরাধীদের সাধারণ তথ্য

এই গবেষণায় আমরা পরিভাষা ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করি। যেহেতু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না, তাই আমরা এই গবেষণায় অপরাধীকে ব্যবহার করেছি। আসামিদের মধ্যে ৯ জন দোষী প্রমাণিত হয়েছেন এবং তিনজন বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। আবার নিম্ন আদালতে দণ্ডিত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন উচ্চ আদালতে আপিল করেন। তবে নিম্ন আদালতে দণ্ডিত দুজন এখনো উচ্চ আদালতে আপিল করেননি।

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, তিনজন ব্যক্তির মধ্যে আগেও অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইতিহাস রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন আগে থেকেই কারাগারে ছিলেন এবং এক বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। আরেকজনের বিরুদ্ধে মাদকাসক্তির অভিযোগ থাকায় থানায় মামলা হয়েছে। আর বাকিদের জন্য কারাগারে থাকার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

২.১ বয়স

দায়েকৃত মামলার তথ্য অনুযায়ী ১৭% অপরাধীর বয়স ২০ বছরের কম। ১৫% আছেন ২০-২৯ বয়সীদের দলে, ১৮% আছেন ৩০-৩৯ বয়সীদের দলে, প্রায় ১৭% আছেন ৪০-৪৯ বয়সী, ২৫% আছেন ৫০-৫৯ বয়স সীমার মধ্যে। আর ৮ শতাংশের বয়স ৬০ বছরের বেশি।

২.২ শিক্ষা

এই ১২ জনের মধ্যে ৮ শতাংশ নিরক্ষর। প্রায় ১৭ শতাংশ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ২৫ শতাংশ দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। আর ২৫ শতাংশ এসএসসি পাস করেছেন। ৮ শতাংশ এইচএসসি পাস। বাকিদের মধ্যে ৮ শতাংশ বিএ/অনার্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ৯ শতাংশ তাদের নাম স্বাক্ষর করতে পারেন।

২.৩ বৈবাহিক অবস্থা

অপরাধীদের ৫০ শতাংশ বিবাহিত, ৩৩ শতাংশ অবিবাহিত। ১৭ শতাংশ তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন।

২.৪ ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিগত পরিচয়

আমরা গবেষণার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। ধর্ষণের পিছনে কোনো ধরনের ধর্মীয় আগ্রাসন কাজ করছে কি না সেটি যাচাই করার জন্য আমরা অপরাধীর ধর্মীয় পরিচয় জানার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, ৮৩% মুসলমান এবং প্রায় ১৭% হিন্দু। আমরা জানতে পেরেছি, অপরাধীরা সবাই বাঙালি।

২.৫ পেশা

এই অপরাধীরা কী ধরনের পেশায় জড়িত ছিলেন এবং তাদের মানসিকতার পেছনে তাদের পেশা কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল তা বিশ্লেষণ করার জন্য এই তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর পাশাপাশি আমরা এর মাধ্যমে অপরাধীদের আর্থিক

অবস্থাও দেখার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে ৮ শতাংশ বেসরকারি চাকরি করেন। একই শতাংশ দিনমজুর ছিলেন। প্রায় ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং একই শতাংশ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে ৮ শতাংশ বেকার। এবং একটি বড় অংশ (৪৩%) অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।

২.৬ যৌন অভিমুখিতা (Sexual Orientation)

এই গবেষণায় আমরা অপরাধীদের যৌন অভিমুখিতা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কারণ বাংলাদেশে এসব বিষয় নিয়ে একেবারেই আলোচনা হয় না। যদিও এর সঙ্গে ধর্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তাদের মনোবিজ্ঞান বোঝার জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৮৩% বিষমকামী (Hetero Sexual) এবং প্রায় ১৭% উভকামী (Bi sexual) ছিলেন।

২.৭ ধর্ষণের অভিজ্ঞতা

এই গবেষণায় আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে, এটি অপরাধীদের প্রথম ধর্ষণ কি না। আমরা দেখেছি যে এর আগে ২ জনের ধর্ষণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং পরে অপরাধী অর্থ ও ভয় দেখিয়ে বাদী পক্ষের সঙ্গে মীমাংসা করেছে। এদের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে অভিযোগ, সে বিভিন্ন মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে জোর করে যৌন মিলনের চেষ্টা করেছিল। এটি তাদের যৌন মিলনের প্রথম অভিজ্ঞতা কি না এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, প্রায় ১৭% এর জন্য ধর্ষণ প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা ছিল। আর ৮৩ শতাংশের পূর্ব যৌন অভিজ্ঞতা ছিল।

৩. ধর্ষণের শিকার নারী শিশুদের অবস্থা

আমরা এই গবেষণায় ধর্ষণের শিকার নারী শিশুদের বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক তথ্য নেয়ার চেষ্টা করেছি।

৩.১ নারী শিশুর বয়স

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে যে, ধর্ষণের শিকার নারীদের বয়স ৩-১৭ বছরের মধ্যে। যার মধ্যে প্রায় ১৭% ছিল ৩-৫ বছরের। ২৫ শতাংশ করে ছিল ৬-৮, ৯-১১ এবং ১২-১৪ বছর বয়সী। আর বাকিদের বয়স ১৫-১৭ বছর।

৩.২ শিক্ষা

আমরা যখন এটি অনুসন্ধান করেছি, তখন আমরা দেখেছি যে এই শিশুদের ৫০% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, ৩৩% প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেনি এবং ১৭% স্কুলে পড়ার মতো বয়সী নয়, অর্থাৎ অনেক ছোটো।

৩.৩ ধর্ম ও জাতি

ধর্ষণের শিকার নারীদের মধ্যে ৮৪% মুসলিম, ১৬% হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। অভিযোগকারীদের ৯২% বাঙালি ও ৮% আদিবাসী।

৪. আত্মীয়তা, বিশ্বাস ও ধর্ষণ

এই ১২টি ঘটনার ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রেই অপরাধী নারী শিশুর আত্মীয়। প্রায় ৪২ শতাংশের ক্ষেত্রে অপরাধী আগে থেকেই পরিচিত ছিল। অর্থাৎ অপরাধী আত্মীয় না হলেও ধর্ষণের শিকার শিশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল ধর্ষক। ৩৩ শতাংশের ক্ষেত্রে অপরাধীরা ছিল অপরিচিত। ধর্ষণের পর এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা এবং মামলা পর্যন্ত নিয়ে আসার বিষয়ে আত্মীয়রাই বাদ সাধেন। Huong [viii] (2012, 44) Sao, নামের একজন নারীর কেসস্টাডি বর্ণনা করেন। সেখানে তিনি দেখান Sao– র মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলে সেটি নিয়ে যেন কোনো ধরনের আইনি লড়াই না হয়, সেটি নিয়ে কীভাবে তার আত্মীয়রা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি পরে এই ঘটনার বিচার চেয়ে একাই মামলা করেন।

১৭ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ধর্ষণের শিকার নারীর বাড়িতেই। অর্থাৎ অপরাধী মেয়েটির নিকটাত্মীয়। সে তাকে আদর করার ভান করে ধর্ষণ করেছে। আমরা জানতে পারি, ঘটনার সময় মেয়েটির মা বাসায় ছিলেন না। মেয়েটি বাড়িতে পড়াাশোনা করছিল। এবং তার এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় মা সেই আত্মীয় বাড়ি গিয়েছিলেন। আর তার এক চাচা তার পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য তাদের বাড়িতে আসতেন। মেয়েটিকে নিজের বাড়িতেই ধর্ষণ করে মেয়েটির চাচা। মামা-চাচার ধর্ষণের ঘটনা কেউ একেবারেই বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ ধারণা করা হয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক বাবার মতো। যদিও বাবার দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা বিরল নয়।

এক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার একজন কন্যা শিশুর মা– শেফালী আকতারের (৩২) বক্তব্য হলো

‘চাচা কখনও আমার মেয়েকে ধর্ষণ করবে কল্পনাতেও আসে নাই। চাচা আর বাপে কোনো পার্থক্য নাই। ওতো তার কাছে মাইয়া। তার লগে কেমনে এ রকম কাম করতে পারছে? এতো ছোটো মেয়েটা আমার। ওতো কিছু বোঝে না। শরীরও হয় নাই। মাত্র সাত বছর ছিল। স্বামী প্রথমে রাজী হয় নাই মামলা করার জন্য। ভয় পাইছে। পরিবারের মান সম্মান আছে না!

উনি (আমার দেবর) মনে করছে আমরা এটা নিয়ে কিছু করব না। উনি মেয়েকে ভয় দেখাইছেন আমাদের না বলতে। আরও সমস্যা আছে। যেহেতু উনি একেবারেই আমাদের ঘরের লোক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা অন্য আত্মীয়ের বাসায় দেখা হয়। তখন মেয়ে খুব বিমর্ষ থাকে এবং ভয়েও থাকে।’

Reshma J K et al (২০২২, ১০) তাঁর কাজে দেখান যে, ধর্ষক জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে হলে পারিবারিক ভয় সবচেয়ে বেশি কাজ করে। সে ভয় শুধু যে মান-সম্মানের তা নয়, সম্পর্ক নষ্ট ও পরবর্তী ক্ষতিরও ভয় থাকে।

এসব গবেষণার একটি বড় অংশই আত্মীয়দের দ্বারা ধর্ষণের শিকার শিশু। এদের মধ্যে ৮ শতাংশ শিশু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চাচাতো ভাইদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

এর কারণ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে চলমান আস্থার সম্পর্ক এবং ধর্ষণের বিচার চেয়ে মামলা না করার প্রবণতা। এই প্রবণতার পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করেছে। প্রথমত, শিশুরা সহজে কথা বলতে পারে না, ধর্ষণের শিকার শিশুটি ভয় পায় এবং বুঝতে পারে না। তাই ঘটনা জানাজানি হওয়ার আশঙ্কা কম। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এ ধরনের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না এবং গুরুত্ব কম দেয়। শেষত, আত্মীয় -স্বজনেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘পারিবারিক সম্মানের’ কথা ভেবে মীমাংসা করার চেষ্টা করে। নিচের কেসটি পর্যালোচনা করে আমরা যেমনটি দেখি—

অভিযুক্ত হেদায়েত উল্লাহ তার ১৫ বছরের শ্যালিকাকে ধর্ষণ করে। অর্থাৎ ধর্ষণের শিকার হয়েছে স্ত্রীর ছোট বোন। ধর্ষণের প্রথম কয়েকদিন পর থেকে সে আবার মেয়েটিকে প্রায়ই ধর্ষণ করত এবং সবাইকে হুমকি দি যে তার শ্যালিকা তাকে সবসময় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে প্রলুব্ধ করে। তখন ধর্ষণের শিকার নারী খুব ভয় পেতেন। তারপর একদিন মেয়েটি তার মাকে জানায়। মেয়ের পরিবারের কথা ভেবে চুপ থাকতে বলেন তার মা। কিন্তু একদিন

মেয়েটি তার বোনকেও জানায়। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। বরং মেয়েকে দোষারোপ করে। পরে মেয়েটির বোন বুঝতে পারে। তার বাবা-মা বিষয়টি নিয়ে মামলা করতে চাননি। কারণ তারা ভেবেছিলেন তাদের দুই মেয়ের মর্যাদা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বড় বোনই ছোট বোনকে মামলা করার পরামর্শ দেন এবং তিনি তার স্বামীকে তালাক দেন।

মামলাটি নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে এই মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্তটি পরিবারের পক্ষে খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। স্বজনরা খুব কাছাকাছি থাকলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয় না, যার কারণে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির কোনো ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয় বা পরিবারের পক্ষ থেকে বিচার করা হয়। যার কারণে দেখা যায়, স্বজনদের মধ্যে ধর্ষণের প্রবণতা বাড়ছে। আর তারা জানেন, এসব মামলায় ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ আমাদের সমাজে আমরা জানি আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যখন কিছু ঘটে তখন পারিবারিক মর্যাদা ও সম্মানের কারণে কেউ তা নিয়ে কথা বলতে চায় না। মামলা ও আইনি প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার চাওয়া দূরবর্তী বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই সামাজিক মানসিকতাকে কাজে লাগাচ্ছে অপরাধীরা।

এর পাশাপাশি কিছু সম্পর্ক (দাদা-দাদি / নাতি-নাতনি, শ্যালিকা / দুলা ভাই, দেবর-ভাবি, বেয়াই-বেয়াইন প্রভৃতি) যৌন হাস্যরস গ্রহণ করে এবং এটিও ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলিতে ভূমিকা রাখে। আর কিছু সম্পর্ক এতটাই স্পর্শকাতর হয় যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও তা অনেকের পক্ষেই বলা মুশকিল হয়ে পড়ে। (Cullen, 2007, 123) দেখান যে কীভাবে যৌন হাসি তামাশা ধর্ষণের মনস্কতা তৈরি করতে সহায়তা করে।

আত্মীয়দের মধ্যে ৩৩ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে অপরাধীর বাড়িতে। শিক্ষায় সহায়তা করা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা এবং তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলে অপরাধীরা শিশুদের তাদের বাড়িতে এনে ধর্ষণ করে। শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষক বাড়ির পেছনের জায়গাটি বেছে নিয়েছে। এটাকে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করে। সেক্ষেত্রে শিশুদের বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রথমে সেখানে নিয়ে গিয়ে পরে ধর্ষণ করা হয়।

৪.১ অপরাধীদের নিজ জীবনে যৌন সহিংসতার অভিজ্ঞতা

৪২ শতাংশ অপরাধীর শৈশবে ধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের যৌন সহিংসতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের এক পুরুষ আত্মীয়, এক শিক্ষক যৌন নির্যাতনের দ্বারা শিকার হয়েছেন বলে জানা

গেছে। আর বাকি ৫৮ শতাংশ জানিয়েছেন, তাদের নিজেদের যৌন সহিংসতার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

সেই সহিংসতার অভিজ্ঞতাও ধর্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সে সময় তাদের প্রতি যে নির্যাতন হয়েছে সেটির প্রতিবাদ করতে পারেনি তারা। কাউকে বলতে পারেনি। তাই তারা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের লক্ষ্যে পরিনত করে। এক দিকে তাদের অভিজ্ঞতা একে অপরকে উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে এটি করে প্রতিশোধের একটি রূপ নেওয়ার চেষ্টা করে। আব্দুর রহমানের (২৭) কেস থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি যখন ছোটো ছিলেন তখন, তাকে বেশ কয়েকবার যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল এবং একবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। কিন্তু তখনও তিনি বিষয়টি কাউকে জানাতে পারেননি। এমন ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। তখন এটা তার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং তিনি এটি অন্য কারও উপরও করতে চেয়েছিলেন। এক সময় সুযোগও পেয়ে যান তিনি। তার খালার বাড়িতে বেড়াতে যেতেন তিনি। সেখানে তিনি তার খালাতো বোনকে স্পর্শ করেন। পরদিন নিজ বাড়িতে তাকে ধর্ষণ করেন। এ নিয়ে তাদের অনেক পারিবারিক বৈঠক হয়েছে। এরপর একটি মামলা হয়। কারণ খালা রাজি হলেও খালুকে রাজি করানো যায়নি। তিনি এ ঘটনার বিচার চেয়েছেন। এ ঘটনার কারণে তাদের দুই পরিবারের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। ধর্ষকরা তাদের নিজস্ব ট্রমা থেকে একই ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা বজায় রাখে। অর্থাৎ অপরাধের শিকার ব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করে, ভিকটিম নিজেও একই ধরনের অপরাধ করে বা এক ধরনের ক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়।

ওয়েজ (Weiss, 2007, 275) দেখান যে আমেরিকাতে যে, সকল পুরুষের শৈশব-কৈশোরে যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের মধ্যে ধর্ষক হয়ে ওঠার প্রবণতা বেশি।

৪.২ জাতিগত বিদ্বেষ

আমাদের একটি কেস ছিল তিন বছরের চাকমাশিশু ধর্ষন। যখন এই গবেষক দলটি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে, তখন তিনি আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা ছিল, "আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে কেউ একটি মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারে যে তার মায়ের দুধ চুষছে?" মামলাটি সম্পর্কে আমরা যা জানি তা হল:

> নিশির বড় বোন মাইনি নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলেন। বোনের দেরি দেখে বোনকে ডাকতে নদীতে যায় নিশি। সে তার বোনকে বলে যে তার মা তাকে

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলেছে। এ সময় তার মা ভুট্টা ক্ষেতে ছিলেন। বোনকে এ কথা বলে মাঠের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এরপর তাকে জোরপূর্বক চেপে ধরে হাতিম আলী (৩১) নামে এক যুবক ধর্ষণ করে। যখন সে বাড়ি ফিরে আসে, তার মা তার যোনিতে রক্ত দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করেছিল। এরপর তার মা তাকে কোলে নিয়ে অপরাধীকে ধরতে ওই মাঠে ছুটে যান। অন্যান্য চাকমা ছেলেদের সহায়তায় তার মা অপরাধীকে ধরতে পারেন। নিশির পরিবার প্রথমে মামলা করতে ভয় পেয়েছিল। কারণ সেখানে বাঙালিরা তাদের আরও ক্ষতি করবে বলে মনে করেছিলেন। পরবর্তীকালে আরও বিপদের আশংকায় তারা মামলা করতে চাননি। কিন্তু কিছু বাঙালি তাদের মামলা করার পরামর্শ দিয়ে আশ্বস্ত করেন যে, তারা এই মামলায় সাক্ষ্য দিবেন।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, হাতেম আলী সেখানে প্রভাবশালী বাঙালির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এর আগেও নিশির পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদ ছিল তার পরিবারের। তারা একাধিকবার নিশির পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা করেছেন। হাতিম আলী এই ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নিশির পরিবারকে 'উচিৎ' শিক্ষা দিতে চেয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। এর আগেও হাতিম আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ তার বিরুদ্ধে যাবার সাহস পায়নি। ওই এলাকার লোকজন তাকে খুব ভয় পেতো। কারণ তিনি শুধু এলাকার সেটেলারই নন[ix], ক্ষমতাসীন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। এই গবেষণায় হাতিম আলীই একমাত্র সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষক যিনি চার বছর কারাগারে কাটিয়েছেন এবং এখন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু যখন আমরা হাতিম আলীর সাথে কথা বলি, তখন তিনি বলেন যে তিনি সেই চাকমা পরিবারকে শাস্তি দিতে চেয়েছেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, একটি শিশুর সাথে এটি করা ধর্ষণ নয়। এটা একটা খেলার মতো ছিল। সে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ছিল না, ধর্ষণের কথা সে কী বুঝল? তিনি আরও বলেছিলেন 'পাহাড়ি'[x] এমনই হয়, স্পর্শ করলে তারা বলে বাঙালি ধর্ষণ করছে। শিশুটি কি বলেছে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে?'

কিন্তু এই ঘটনা বদলে দিলো নিশিকে। নিশি বাইরে যেতে চাইছিলেন না এবং খুব চুপচাপ হয়ে গেলেন। পার্বত্য সমাজে তাকে নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। তিনি পাহাড়ি শিশুদের সাথে খেলতে যেতেন এবং ঝগড়া হলে পাহাড়ি শিশুরা তাকে ডাকত 'বাঙ্গল লাগা'[xi]

বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না; আশেপাশে কোনো বাঙালি মানুষ দেখলেই তিনি কাঁদতেন। তার বাবা একদিন তাকে আদালতে নিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি আদালতে অপরাধীদের দেখে অজ্ঞান হয়ে যান।

এই এলাকায় বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে অশান্তির কারণে এ ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা আলামত সংগ্রহ করেছি। ঘটনার কিছুদিন আগে কাওয়াজ (ঝগড়া) হয়েছিল। তার মা মনে করতেন, তার মেয়েকে ধর্ষণ করাও এর একটি অংশ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের শিশুকে সাধারণত ধর্ষণ করা সম্ভব নয়।

এখন সেই অপরাধী মুক্ত। তবে নিশি এবং তার পরিবার আশংকা করছেন যে, অপরাধীরা আবার প্রতিশোধ নিতে চাইতে পারে। আর এর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। আদিবাসি মেয়ে, তোকে জেলে নিয়ে গিয়েছিল?"– এ কথা বলে অন্যরা আসামিদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। এর কারণে তিনি আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ধর্ষণ করার হুমকি দেন।

আমরা দেখছি জাতিগত বিদ্বেষ, যুদ্ধ, সংঘর্ষের সময় ধর্ষণকে শত্রুপক্ষকে আক্রান্ত করার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মুখার্জী (Mookherjee, 2015) তাঁর কাজে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেটির ওপর আলোকপাত করেছেন এবং কীভাবে এই অস্ত্র একজন নারীর সারা জীবনকে প্রভাবিত করে এবং জাতি-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে তা দেখিয়েছেন।

৪.৩ ধর্মীয় ঘৃণা

এই গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি, জাতিগত বিদ্বেষ ছাড়াও ধর্মীয় বিদ্বেষও কন্যা শিশু ধর্ষণের কারণ। এই গবেষণায় ধর্ষণের শিকার দুজন শিশু পারিবারিক ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু। তাদের একজনকে ধর্ষণ করেছিল এক মুসলিম অপরাধী। এই ১২টি মামলার একজন মুসলিম নারীশিশুকে ধর্ষণ করেছিলেন এক হিন্দু অপরাধী। দুটি ক্ষেত্রে দুই ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করে। একটি স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

৪.৩.১

কেস-১

অপরাধীর সঙ্গে মেয়েটির মায়ের আগেও নানা সমস্যা ছিল। অপরাধী মেয়েটির মাকে পছন্দ করে, মুসলমান হতে বলে এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তিনি মেয়েটির মাকে বেশ কয়েকবার উত্ত্যক্ত করেন এবং পরে তার মা মামলাটি ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যান। তখন তিনিসহ এলাকার অন্য বখাটেরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং মেয়েটির মাকে বেশ কয়েকবার হুমকি দেন। মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তো। তারা একই এলাকায় বাস করতেন। ঘটনার দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপরাধী মেয়েটিকে বলে যে, সে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিবে। অপরাধীর সঙ্গে একটি বাইক ছিল। মেয়েটি বাইকে উঠলে অপরাধী মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, এই ধর্ষণের পর অপরাধী পরে হুমকি দেয় এই বলে যে, 'এই দেশ মুসলিমদের, হিন্দুরা এখানে কিছুই করতে পারবে না। বরং বাড়াবাড়ি করলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

তাই প্রথমে মেয়েটির মা মামলা করতে চাননি। অপরাধী ধর্ষণের শিকার মেয়েটির মায়ের উপর ক্ষেপেছিল। কারণ তিনি তাকে অন্যদের দিয়ে অপমান করেছিলেন। এই ঘটনার পর অপরাধীর স্বজনরা মেয়েটির বাড়িতে এসে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করেছে এবং এখনো করছে। সে মেয়েটির মাকে মামলা দিতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু মেয়েটির মা সেটি শুনেনি। তার মেয়ের ধর্ষণের বিচার চেয়েছে। কারণ তারা অপরাধীর পরিবার মনে করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে অমুসলিমরা একজন মুসলমানের কথা শুনবে না, এটা তারা মেনে নিতে পারেন না।

এই ঘটনার পর অপরাধীর পরিবার হিন্দুদের ঘৃণা করতে শুরু করেন এবং এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন। এর মাধ্যমে তিনি হিন্দুদের যথাযথ শিক্ষা দেবেন বলে মনে করছেন। মেয়েকে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে মেয়েটির মাকে বিয়ে করতে না পারার রাগ মেটাতে চেয়েছেন অপরাধী।

৪.৩.২ কেস-২

আরেকটি মামলার ধারা বিবরণী বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি, ধর্ষণের শিকার নারী মুসলিম ছিলেন। অপরাধী পেশায় দিনমজুর এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু।। মেয়েটির মা একটি বাড়িতে কাজ করতেন। মেয়েটি মাঝেমধ্যে তার মায়ের সঙ্গে ওই বাড়িতে যেতো। ঘটনার দিনও মেয়েটির মা অন্যান্য দিনের মতো কাজে গিয়েছিলেন। মেয়েটি তখন ওই ঘর থেকে বেরিয়ে একটু দূরে একা একা কাদা নিয়ে খেলা করছিল। এরপর মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়। মেয়েটি চিৎকার করেছিল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

কাজ থেকে ফিরে এসে মেয়েটিকে অনেকক্ষণ খুঁজে পাননি তার মা। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পর মেয়েটির মা রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করেন এবং জ্ঞান ফিরে এলে মেয়েটি অপরাধীকে শনাক্ত করে। মেয়েটি তার মাকে জানায় যে, লোকটি তাকে মেরেছে। মেয়েটি আর কিছু বলতে পারেনি। অপরাধী ভেবেছিল মেয়েটি তাকে চিনতে পারবে না।

উপরিউক্ত দুটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই তা হলো, ধর্মীয় আগ্রাসন ও ক্ষমতার প্রয়োগ একটি সহিংস মানসিকতাকে উস্কে দেয়। যেমনঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করে হিন্দু নারীদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অপরাধী আরও মনে করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাকে সমর্থন করবে। হার্টম্যান (Hartmann et al, 2011) তাঁদের কাজে দেখান যে, একদিকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য, নেতিবাচক ধারণা ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সহিংসতা তৈরি করার মনস্কতা তৈরি করে, যা লিঙ্গীয় ক্ষমতায় ধর্ষণের মত নিপীড়নের দিকে আগায়। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর ক্ষমতার সম্পর্ক দিয়ে নিপীড়নের মানসিকতাকে সব সময় সাধারণীকরণ করা যায় না। যেমনঃ হিন্দু পুরুষদের মুসলিম শিশুদের ধর্ষণের ছবি আছে। কারণ তিনি মনে করেন, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র তার পক্ষে থাকবে, কারণ তিনি পুরুষ। Green and Bailez (2001) এবং Lyons (2008) দেখান যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর মধ্যকার সম্পর্ক লিঙ্গীয় সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করে।

৫. নারীশিশু ধর্ষণ আকস্মিক নয়, পরিকল্পিত

শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ধর্ষণ আকস্মিক হওয়ার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, অপরিচিতরা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেছে, ধর্ষণের শিকার শিশুর বাড়িতে কিংবা বাড়ির কাছেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তারা এমন আচরণ করে যেন তারা জানে মেয়েটি কোথায় থাকে, ঘরে আর কে থাকে, মেয়েটি কোথায় যায় এবং তার সাথে কে থাকে।

অনেক সময় হঠাৎ করেই মেয়েটির সঙ্গে আগন্তুককে খেলতে দেখা যায়। এছাড়া বিস্কুট বা খাবার খাওয়া অথবা কোলে নেওয়ার নাম করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটানো হয় বলে জানা গেছে। আর এই অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়া বেশিরভাগ শিশুর বয়স ১০ বছরের নিচে।

৬. উপসংহার ও করণীয়

ধর্ষণকারীদের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে বেশিরভাগই (৮৩%) ছিল বিষমকামী। অর্থাৎ কন্যাশিশু ধর্ষণকে তারা নিরাপদ মনে করে। কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করলে সে কাউকে কিছু বলবে না বা বলতে পারবে না, এধরনের একটি ধারণা ধর্ষণকারীর মধ্যে কাজ করতে পারে। এধরনের নিরাপত্তাবোধ ধর্ষণকারীকে কন্যাশিশুকে ধর্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ধর্ষণকারীদের ধর্ষণের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৮৩% ধর্ষণকারীরই পূর্বে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ যেসকল ব্যক্তির পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের দ্বারা কন্যাশিশু ধর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষণকারীরা হয় আত্মীয় বা আগে থেকেই পরিচিত ছিল। তার মানে, ধর্ষণকারীরা মনে করে যে আত্মীয় বা পরিচিতদের ধর্ষণ করলে তাদের পক্ষে এটা গোপন রাখা বা 'ম্যানেজ করা' সহজ। এধরনের ভাবনা থেকে ধর্ষণকারীরা ধর্ষণে লিপ্ত হতে পারে। এমনকি ধর্ষণের শিকার হওয়া কন্যাশিশুর নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেও একই ধরনের ব্যখ্যা পাওয়া যায়। ধর্ষণকারীরা মনে করে যে, ধর্ষণ করলেও তাদের বিরুদ্ধে আত্মীয়রা সহজে মামলা করবে না, মামলা করলেও এসকল মামলায় শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ এগুলো প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। এরকম মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা থেকেও অনেকে ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়।

ধর্ষণকারীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়ছে যে, তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ শৈশবে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তাদের প্রতি হওয়া এই যৌন সহিংসতা তারা মানসিকভাবে অবদমন করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তাদের এই অবদমিত আবেগকে তাদের চেয়ে যারা শক্তিতে বা সামর্থ্যে কম তাদের প্রত প্রকাশ করেছেন যার একটি মাধ্যম হচ্ছে এক সাথে ধর্ষণ।

জাতিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্ষণকারীরা অনেক সময় তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য কন্যা শিশুদের ধর্ষণ করে। ক্ষমতাসীন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সদস্যগণ কন্যাশিশুদের ধর্ষণ করতে নিরাপদ বোধ করেন। এরকম মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা তাদেরকে ধর্ষণে অবচেতনভাবে প্ররোচিত করে। অনেক শিশুই নির্যাতনের শিকার হলে তাদের বাবা-মাকে জানায় না, আর সন্তান যদি

খুব ছোটো হয়, তবে সে কথা বলার ক্ষমতা রাখে না। এ কারণেই হয়ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে শিশুরা। খারাপ স্পর্শ (Bad touch), ভালো স্পর্শ (Good Touch) ইত্যাদি বুঝে ওঠার আগেই অনেক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। তবে, আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বেশিরভাগ কর্মসূচি নারীদের জন্য পরিচালিত হয় এবং লিঙ্গ সমতার দিকে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছেলেদের নিয়ে খুব বেশি কর্মসূচী নেই।

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি এক ধরনের অবহেলা রয়েছে। ধর্ষণের মানসিকতার কারণে আমরা এটাকে বিবেচনায় নেওয়ার চেয়ে লুকিয়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করি এবং ধামাচাপা দেওয়ার কারণে শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রটিকে অনেক সময় উৎসাহিত করা হয়। এই গবেষণায় আমরা দেখেছি, ধর্ষণের ঘটনার আগে অনেকের এ ধরনের অপরাধ করার ইতিহাস ছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক চাপ ও পারিবারিক সালিশের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়েছে। আগের ঘটনাগুলোর জন্য কোনো প্রতিবাদ বা শাস্তি না হওয়ার কারণে ধর্ষণের মানসিকতাও বেড়েছে বলে দেখা গেছে।

বরং তা না করে পারিবারিক পর্যায়ে যদি এই যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের মানসিকতার কোনো ধরনের আভাস পাওয়া যায় (যৌন কৌতুক, যৌন আনন্দ, যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়ন) তাহলে অনতিবিলম্বে তার ভুল সংশোধন করে এ বিষয়ে দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে তাকে সচেতন করা প্রয়োজন। তাই তখন থেকে যদি কাউন্সেলিং করা যায়, তাহলে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ ধরনের মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমরা এটাও দেখেছি যে, ধর্ষণের শিকার হওয়ায় অভিভাবকরা মামলা করতে কম আগ্রহী হন এবং অপরাধীর পরিবার মামলা প্রত্যাহার না করলে প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় দেখায়। সেক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারী তার পরিবার ও স্বজনদেরও কাউন্সেলিং প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারিভাবেও এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া অপরাধীর পরিবারেরও কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা যে ঘৃণার রাজনীতি চর্চা করি, তা আসলে তাদের সংশোধনের সুযোগ দেয় না। কারণ তার পরিবারও মানসিকভাবে খুবই দুর্বল থাকে।

অপরাধের সঙ্গে লোকলজ্জা জড়িত। সবকিছু সামলানোর জন্য তার কাউন্সেলিং দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে কাউন্সেলিংকে সিরিয়াসলি নেওয়া হয় না। পরবর্তী ধাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ধর্ষণের আসামিদের একটি বড় অংশ খুব অল্প সময়ে জামিনে জেল থেকে বের হয়ে যায়। ধর্ষণ জামিন অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তারা আইনের নানা

ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে। জেল থেকে বেরোনোর পর ওরা একটাই কাজ করে প্রতিশোধ নেওয়া। ফলে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে ধর্ষণের শিকার নারী ও তার পরিবারের ক্ষতি করার চেষ্টায়। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এসব আসামিদের বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা এই প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রবণতা থেকে নিজেদের সরিয়ে অন্যায় সংশোধন করতে পারে। সব ক্ষেত্রেই সরকারি-বেসরকারি কাউন্সেলিং ব্যবস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন।

[এই গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের গবেষণা বরাদ্দের আওতায় সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মূল গবেষণাটি ছিল, Social Psychology of Child Rape: Perspectives from Perpetrators].

---

[i] *সেভ দ্য চিলড্রেনের* চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যান্ড চাইল্ড প্রটেকশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুসন্ধান, *আসকের* হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ফোরাম এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলো দ্বারা সংগৃহীত তথ্য। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৩ নভেম্বর ২০২৩. দেখুন https://www.bd-pratidin.com/city/2023/11/30/943984

[ii] *ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ*, ২০২৩

[iii] তথ্যসূত্রঃ ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, *জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের* চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রিস্ট -এর সহযোগী অধ্যাপক।

[iv] বাংলাদেশ গেজেট, ১৩ অক্টোবর, ২০২০।

[v] 'হাইপার পুরুষত্ব' একটি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক টার্ম যেটি প্রথাগত পুরুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণের উদ্ধত ভঙ্গি। এ বিষয়ে কাজ করেছেন Mosher (1984), aren (April 2004), Dominic J. (2003), McGuire, James (2009).

[vi] গবেষণার নৈতিকতা ও গবেষণা বিষয়টির সংবেদনশীলতা বজায়ের কারণে জেলাগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি, তবে গবেষণা প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে । তবে কেউ এই বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হলে তাদের সহায়তা করা হবে।

[vii] গবেষকদের দায়িত্ব তাদের কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যা শ্রদ্ধাশীল, সংবেদনশীল এবং পুনরায় আঘাত, বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সামাজিক হেনস্থা না হয়। বিস্তারিত দেখুন Tanya Goyal (2023) Ethical Implications of Research on Rape Victims and Responsible Pathways, (2023) Conference Paper, Conference: Ethics in Human Sciences Research and Publication At: Jawaharlal Nehru University, India

[viii] বিস্তারিত দেখুন, Nguyen Thu Huong (2012) Rape disclosure: the interplay of gender, culture and kinship in contemporary Vietnam. Culture, Health & Sexuality Vol. 14, No. S1, November 2012, S39–S52

[ix] পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত বাঙালীরা দু'ভাবে পরিচিত। যারা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই ঐ অঞ্চলে থাকেন, তাদের বলা হয় 'আদি বাঙালী।' অন্যদিকে যাদেরকে 'উন্নয়ন' প্রকল্পের আওয়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদেরকে পাহাড়ীরা 'সেটেলার' বাঙালী বলে|

[x] পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা সেখানে বসবাসকারীদের 'আদিবাসী' দের 'পাহাড়ি' নামে ডাকে।

[xi] ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার বাঙালি নারীদের যেমন 'খানে লাগা' বলা হতো, তেমনি বাঙালিদের হাতে ধর্ষিত আদিবাসীদের বলা হতো বাঙাল লাগা, অর্থাৎ শত্রুর স্পর্শ। এবং তার উপরে তারা তাকে আরও অপমান করার চেষ্টা করে।

সহায়কপঞ্জি:

Cullen, A 2007. The effect of sexist humor and type of rape on men's self-reported rape proclivity and victim blame, Current Research in Social Psychology.

DeKeseredy, W.S., & Schwartz, M.D. (2005). Masculinities and interpersonal violence. In M. S. 353-366). Thousand Oaks: Sage.

Dominique A. Simons, Sandy K. Wurtele, Robert L. Durham (2008) Developmental experiences of child sexual abusers and rapists. Child Abuse and Neglect: The International Journal Volume: 32 Issue: 5 Dated: May 2008 Pages: 549-560.

Green et al (2001) Measuring Gay Populations and Antigay Hate Crime, SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, Volume 82, Number 2, June . ©2001 by the Southwestern Social Science Association.

Gavey, N (2005) Just Sex?: The Cultural Scaffolding of Rape, Psychology Press, 2005

Hartmann, Douglas, Daniel Winchester, Penny Edgell, and Joseph Gerteis. 1911. How American understand racial and religious differences. Sociological Quarterly 52 (3), 323-45 .

Huong T N (2012) Rape disclosure: The interplay of gender, culture and kinship in contemporary Vietnam, Culture, Health & Sexuality 14(sup1), DOI: 10.1080/13691058.2012.675516

Kabir et al (2017) Rape in Bangladesh: A Heinous Crime Tough to Prove, The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention 4(7)DOI: 10.18535/ijsshi/v4i7.11

Kimmel, J. Hearn, & R. W. Connell (Eds.), 2004 Handbook of studies on men and masculinities (pp.

Kilmartin, C., & Berkowitz, A.D. (2001). Sexual assault in context: Teaching college men about gender. Mahwah: Lawrence Erlbaum

Associates.Rozee, P.D., & Koss, M.P. (2001). Rape: A century of resistance. Psychology of Women, 25, 295-311.

Malamuth, N.M. (1981). Rape proclivity among males. Journal of Social Issues, 374(4), 138-157.

Malamuth, N.M., & Check, J.V.P. (1984). Debriefing effectiveness following exposure to pornographic rape depictions. Journal of Sex Research, 20, 1-13.

Mookherjee, N. (2015). The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971. Duke University Press

Norris, J., & Cubbins, L. A. (1992). Dating, drinking, and rape: Effects of victim's and assailant's alcohol consumption on judgments of their behavior and traits. Psychology of Women Quarterly, 16(2), 179–191. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1992.tb00248.

Prentky, R. A., & Knight, R. A. (1991). Identifying critical dimensions for discriminating among rapists. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(5), 643–661. https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.5.643

Kilmartin, C. (2000). The masculine self (2nd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Companies, Inc.

Nasreen, Z (2021) Qualitative Research to Identify the Cultural Challenges to Women's Access to Justice, unpublished research report, UNDP.

Presley CA, Meilman PW, Leichliter JS. College factors that influence drinking. Journal of Studies on Alcohol. 2002;63(Suppl 14):82–90.

Rahman et al (2021) A Sociological Study on the Rape, Rapist and the Victim of Rape in Bangladesh, Journal of Social Sciences and Humanities Review (JSSHR)Vol. 5, No. 2 (59-74)© Author(s) 2020ISSN: 2279-3933.

Reshma J K, et al (2022) Socio-cultural and psychological aspects of rape: Perspectives of young men

from Kerala, Cogent Social Sciences, 8:1, DOI: 10.1080/23311886.2022.2064589

Rozee, P. D., & Koss, M. P. (2001). Rape: A Century of Resistance. Psychology of Women Quarterly, 25(4), 295-311. https://doi.org/10.1111/1471-6402.00030

Schwartz, S. H., & Sagiv, L. (1995). Identifying culture-specifics in the content and structure of values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26(1), 92–116. https://doi.org/10.1177/0022022195261007

Stotzer, Rebecca L. and MacCartney, (2015) The Role of Institutional Factors on On-Campus Reported Rape Prevalence, Journal of Interpersonal Violence 31(16)

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, https://www.prothomalo.com/opinion/column/43hz7bvgi1

Weiss, K. G. (2010). Male Sexual Victimization: Examining Men's Experiences of Rape and Sexual

Assault. Men and Masculinities, 12(3), 275-298. https://doi.org/10.1177/1097184X08322632